জীবপ্রযুক্তি

ইউনিট ১৪

ভূমিকা

জীববিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখার নাম জীবপ্রযুক্তি। বাস্তব জগতে শাখাটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। মানুষের কল্যাণে জীবপ্রযুক্তি ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এ অধ্যায়ে জীবপ্রযুক্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হবে।

টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি

ডিএনএ

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৪.১ : জীবপ্রযুক্তির ধারণা
পাঠ ১৪.২ : টিস্যু কালচার এবং এর ব্যবহার
পাঠ ১৪.৩ : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
পাঠ ১৪.৪ : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার

পাঠ-১৪.১ জীবপ্রযুক্তির ধারণা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীবপ্রযুক্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জীবপ্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- জীবপ্রযুক্তির পরিসর উল্লেখ করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	জীবপ্রযুক্তি, Biology, Technology

জীবপ্রযুক্তি (Biotecnology) : কোন জীবকে মানবকল্যাণে প্রয়োগের যে কোনো প্রযুক্তিকে বলা হয় জীবপ্রযুক্তি। আজ বহুল প্রচারিত এবং প্রসারিত জীবপ্রযুক্তি শব্দটি নতুন হলেও মানব কল্যাণে জীবজ প্রতিনিধির ব্যবহার অনেক আগের। মানব সভ্যতার ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই দুধ থেকে দই, মাখন, পনির ইত্যাদি এবং গাঁজন বা চোলাইকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মদ, অ্যালকোহল, পাউরুটি প্রভৃতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অণুজীবের ব্যবহার এবং উন্নত জাতের গো-মহিষ ও ফসল নির্বাচনের জন্য জীবজ বা কোষীয় উপাদানের ব্যবহার হয়ে আসছে। জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানব কল্যাণে ব্যবহৃত জীবের এবং জৈব উপাদানের গুণগত মান বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন নতুন মূল্যবান উপাদান সৃষ্টি এবং এদের ব্যবহারের সহজ ও উন্নত কলাকৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে।

হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরেকি (১৯১৯) সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি প্রবর্তন করেন। জীবপ্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি উন্নয়নশীল ফলিত শাখা। Biotechnology শব্দটি Biology এবং Technology এর সমন্বয়ে গঠিত। Biology শব্দের অর্থ জীব সম্পর্কিত বিদ্যা এবং Technology শব্দের অর্থ প্রযুক্তি। অর্থাৎ Biotechnology হলো Biological Science এর সাথে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বিত বিদ্যা। ১৯৭০ এর পর থেকে এ শব্দটি বর্তমান বিশ্বে ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে Biotechnology কে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

U.S. National Science Foundation এর মতে 'মানব কল্যাণে জৈবিক উপকরণ যথা- অণুজীব অথবা কোষীয় উপাদানের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারই Biotechnology'। International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC-1981) এর মতে 'জীবপ্রযুক্তি হলো শিল্পে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদিত দ্রব্য এবং শিল্প পরিবেশের উপর প্রাণরসায়ন, জীববিজ্ঞান, অণুজীববিজ্ঞান এবং রসায়ন প্রকৌশলের প্রয়োগ'।

জীবপ্রযুক্তির ইতিহাস : সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ তাদের কাজের জন্য জীবপ্রযুক্তির সাথে জড়িত। স্থূল অর্থে মানুষ যখন কৃষিকাজ ও পশুপালন শুরু করে তখন থেকেই জীবপ্রযুক্তির গোড়াপত্তন হয়েছিল। মানুষ তাদের সংগৃহীত জীবের উন্নয়নে নির্বাচন ও সংকরায়ন করে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অধিক উৎপাদনক্ষম জীব উৎপাদন করতে থাকে। এগুলো ছিল জীবপ্রযুক্তির প্রাথমিক ধাপ। আমরা গাঁজন ও চোলাইকরনের (Fermentation and Brewing) সাথে অনেকেই পরিচিত। বহুকাল পূর্ব হতেই বিয়ার তৈরিতে গাঁজন প্রক্রিয়া মেসোপটেমিয়া, মিশর, চীন ও ভারতে প্রচলিত আছে। মদশিল্পে ঈস্টের ব্যবহার একটি সাধারণ বিষয়। গাঁজন প্রক্রিয়া সম্পর্কে লুই পাস্তরের (১৮৫৭) কাজটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সে সময় গাঁজন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেন। গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮৬৩) কর্তৃক কৌলিতত্ত্ব (Genetics) এর সূত্রসমূহ আবিষ্কার জীবপ্রযুক্তির সম্ভাবনার নতুন পথ দেখিয়েছে। চেইম উইঝম্যান (১৯১৭) কর্ণ স্টার্চে *Clostridium acetobutylicum* ব্যাকটেরিয়ার বিশুদ্ধ আবাদ হতে অ্যাসিটোন উৎপাদন করেন যা ইউরোপিয়ানরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিস্ফোরক তৈরিতে ব্যবহার করেন। সেটি ছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বা নিজ এলাকায় শত্রুমুক্ত করার একটি অগ্রসর পদক্ষেপ। আলেক্সান্ডার ফ্লেমিং (১৯২৮) পেনিসিলিয়াম হতে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। এটা মানুষের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। এ অ্যান্টিবায়োটিকটি বর্তমানে ওষুধশিল্পে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। Watson এবং Crick (১৯৫৩) এর ডিএনএ ডবল হেলিক্স মডেল আবিষ্কারের ধারাবাহিকতায় জীবপ্রযুক্তি আধুনিকতার পথে অগ্রসর হয়েছে। পল বার্গের (১৯৭১) জিন স্প্লাইসিং পরীক্ষা হতে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির যাত্রা শুরু হয়। জীবপ্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মধ্যে

রয়েছে, ১৯৮৩ সালে পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (PCR) এর ব্যবহার, ১৯৮৪ সালে জেনেটিক ফিঙ্গার প্রিন্টিং পদ্ধতি উদ্ভাবন, ১৯৮৭ সাল থেকে জিন পৃথকীকরণ, ১৯৯৭ সালে প্রথম ক্লোন প্রাণীর জন্ম (ডলি), ২০০১ সালে সম্পূর্ণ মানব জিনোম সিকুয়েন্স নির্ণয়, ২০০৪ সালে গোল্ডেন রাইস, ২০০৫ সালে সুপার রাইস উদ্ভাবন ইত্যাদি।

জীবপ্রযুক্তির পরিসর : জীবপ্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি শাখা সত্ত্বেও এর সম্প্রসারণ খুব দ্রুত হচ্ছে। জীবপ্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলো হলো- (ক) টিস্যু কালচার, (খ) মলিক্যুলার বায়োলজি, (গ) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং (ঘ) উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব। সম্প্রতি আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণার জীবপ্রযুক্তির যে প্রসার ঘটেছে তাকে বলা হয় নতুন জীবপ্রযুক্তি।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন		
পেনিসিলিয়াম কে আবিষ্কার করেন ?	ডলির জন্ম কত সালে ?	জীবপ্রযুক্তির অন্তর্গত শাখাগুলো কী কী ?	গোল্ডেন রাইস কবে উদ্ভাবন হয় ?

সারসংক্ষেপ

জীবপ্রযুক্তি হলো শিল্পে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদিত দ্রব্য এবং শিল্প পরিবেশের উপর প্রাণরসায়ন, জীববিজ্ঞান, অণুজীববিজ্ঞান এবং রসায়ন প্রকৌশলের প্রয়োগ। জীবপ্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলো হলো- (ক) টিস্যু কালচার, (খ) মলিক্যুলার বায়োলজি, (গ) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং (ঘ) উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জীবপ্রযুক্তি শব্দটি সর্বপ্রথম কে প্রবর্তন করেন এবং কত সালে ?

(ক) কার্লএরেকি, ১৯১৯ (খ) কার্ল এরেকি, ১৯১৮

(গ) মেন্ডেল, ১৯১৯ (ঘ) ওয়াটসন ও ক্রিক, ১৯১৯

২। জীবপ্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলো হলো-

i. টিস্যু কালচার ii. মলিক্যুলার বায়োলজি iii. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। জীবপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়-

i. ট্রান্সজেনিক জীব উৎপাদনে ii. গাঁজনে iii. চোলাইকরণে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.২ টিস্যু কালচার এবং এর ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- টিস্যু কালচার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- টিস্যু কালচার এর প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।
- টিস্যু কালচার পদ্ধতি বা প্রযুক্তি বর্ণনা করতে পারবেন।
- টিস্যু কালচার এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	এক্সপ্ল্যান্ট, পুষ্টি মাধ্যম, ক্যালাস

টিস্যু কালচার : জীবদেহের গঠন ও কার্যকারিতার একককে কোষ বলা হয়। জীবদেহ এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত। উৎপত্তিগতভাবে একই কাজ করে এমন ধরনের সম বা ভিন্ন আকৃতির কোষ সমষ্টিকে টিস্যু বলা হয়। এ টিস্যুকে জীবাণুমুক্ত কোন পুষ্টিযুক্ত মাধ্যমে চাষ ও বৃদ্ধি করাকে সংক্ষেপে টিস্যু কালচার (Tissue culture) বা টিস্যু আবাদ বলা হয়। টিস্যু কালচার উদ্ভিদবিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা এবং এ শাখার সাথে অন্যান্য শাখাসমূহ, যেমন- উদ্ভিদ প্রজনন, উদ্ভিদ উৎপাদন, বংশগতিবিদ্যা, কোষ বংশগতিবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা ইত্যাদি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

উদ্ভিদের যে কোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে (যেমন- শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচিপাতা, পত্রবৃন্ত, পরাগধানী, ভ্রূণ, ডিম্বক ইত্যাদি) বিচ্ছিন্ন কোন টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পুষ্টিবর্ধক মাধ্যমে আবাদ করাকে টিস্যু কালচার বলা হয়। টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উল্লিখিত টিস্যু থেকে অধিক সংখ্যক নতুন চারা উদ্ভিদ উৎপাদন করাই টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

টিস্যু কালচার জীবপ্রযুক্তির একটি নতুন মাধ্যম হলেও, ইতিমধ্যে এ প্রযুক্তি দ্বারা উদ্ভিদ প্রজনন, উদ্ভিদ উৎপাদন ও উদ্ভিদের মান উন্নয়নে ব্যাপক সফলতা এসেছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের টিস্যু কালচার পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে এবং এসব গবেষণালব্ধ ফলাফল মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্যিকভাবে উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করা হচ্ছে। ফলে টিস্যু কালচার পদ্ধতি ইতিমধ্যে এ সমস্ত দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছে।

টিস্যু কালচারের প্রকারভেদ : টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় একটি কোষ, কোষগুচ্ছ বা টিস্যু, একটি সম্পূর্ণ অঙ্গ বা সম্পূর্ণ এককোষী জীব কালচার করা যায় অর্থাৎ টিস্যু কালচারের অর্থ ব্যাপক। ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করলে টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। যেমন- (ক) কক্ষমুকুল কালচার, (খ) মেরিস্টেম কালচার, (গ) মাইক্রোপ্রোপাগেশন, (ঘ) ক্যালাস কালচার এর মাধ্যমে চারা উৎপাদন, (ঙ) দৈহিক কোষ থেকে ভ্রূণ উৎপাদন, (চ) পরাগধানী কালচার এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন ইত্যাদি।

টিস্যু কালচার পদ্ধতি : টিস্যু কালচার পদ্ধতি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়। নিম্নে টিস্যু কালচার পদ্ধতির ধাপগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো-

১। এক্সপ্ল্যান্ট নির্বাচন : টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদের যে সকল অংশ পৃথক করে ব্যবহার করা হয় তাকে এক্সপ্ল্যান্ট বলা হয়। উন্নত গুণসম্পন্ন, সতেজ, স্বাস্থ্যবান ও রোগমুক্ত উদ্ভিদকে এক্সপ্ল্যান্টের জন্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত মাতৃ উদ্ভিদ থেকে জীবাণুমুক্ত ধারালো ছুরি দিয়ে এক্সপ্ল্যান্ট কেটে নেওয়া হয়। পুষ্টি মাধ্যমে স্থানান্তরের আগে এক্সপ্ল্যান্টকে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, ব্রোমিন পানি বা ৭০% অ্যালকোহল ইত্যাদির যে কোনো একটি ব্যবহার করে পৃষ্ঠতলীয় নির্বীজন (Surface sterilization) করে নিতে হবে।

২। আবাদ মাধ্যম তৈরি : টিস্যু কালচারের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে পুষ্টিমানের উপর। টিস্যু কালচারের জন্য কোন একক পুষ্টি মাধ্যম নেই। বিভিন্ন প্রকার আবাদ মাধ্যম এর মধ্যে MS মিডিয়া (Murashige and Skoog 1962) ও বি৫ মিডিয়াম (Gamborg *et al.* 1968) সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টি, ভিটামিন, ফাইটোহরমোন, সুক্রোজ এবং অর্ধ কঠিন মাধ্যম (Semi-Solid Medium) তৈরির জন্য জমাট বাঁধার উপাদান, যেমন অ্যাগার (Agar) প্রভৃতি সঠিক মাত্রায় মিশিয়ে আবাদ মাধ্যম তৈরি করা হয়। উল্লেখ্য পুষ্টি মাধ্যমের p^H নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা ৫.৫- ৫.৮ এর মধ্যে রাখাই উত্তম। সঠিক মাত্রায় এসব মৌলিক পুষ্টি উপাদান-সমৃদ্ধ পুষ্টি মাধ্যমকে ব্যালান্সড মিডিয়ামও বলা হয়।

৩। জীবাণুমুক্ত আবাদ প্রতিষ্ঠা : পুষ্টি মাধ্যমে এক্সপ্ল্যান্ট স্থানান্তরের আগে একে জীবাণুমুক্ত করতে হয়। একে নির্বীজকরণ বলা হয়। কালচার মিডিয়ামে থাকে পুষ্টি উপাদান তাই সহজেই জীবাণু জন্মাতে পারে। কিন্তু কালচার করার জন্য মিডিয়াম এবং এক্সপ্ল্যান্ট জীবাণুমুক্ত থাকা আবশ্যক। এজন্য আবাদ মাধ্যমকে কাচের পাত্রে (যেমন- টেস্টটিউব, কনিক্যাল ফ্লাক্স) নিয়ে তুলা বা প্লাস্টিকের ঢাকনা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হয়। পরবর্তীতে অটোক্লেভ যন্ত্রে ১২১° সে. তাপমাত্রায় ১৫ lb/sq. inch চাপে ২০ মিনিট রেখে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

৪। মিডিয়ামে এক্সপ্ল্যান্ট স্থাপন : জীবাণুমুক্ত তরল আবাদকে ঠান্ডায় জমাট বাঁধার পর এক্সপ্ল্যান্টগুলোকে এর মধ্যে স্থাপন করা (Inoculate) হয়। এক্সপ্ল্যান্ট কনিক্যাল ফ্লাক্স বা টেষ্টটিউবে রাখা পুষ্টি মাধ্যমে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে নিচের কাঁটা প্রান্তটি পুষ্টি মাধ্যম স্পর্শ করে অবস্থান করে। তারপর কাচের পাত্রের মুখ পুনরায় বন্ধ করে দিতে হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি একটি লেমিনার এয়ার ফ্লো (Laminar-Air-Flow) নামক যন্ত্রের মধ্যে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে করা হয়।

৫। ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি : নির্দিষ্ট আলোর তীব্রতা ৩০০০-৫০০০ লাক্স, আর্দ্রতা ৭০-৭৫% ও তাপমাত্রা ১৭°-২০° সে. সম্পন্ন নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বর্ধনের জন্য রাখা হয়। এ পর্যায়ে আবাদে স্থাপিত টিস্যু বারবার বিভাজনের মাধ্যমে সরাসরি অণুচারা (Plantlets) তৈরি করে বা অবয়বহীন টিস্যু মন্ডে পরিণত হয়। এ টিস্যু মন্ডকে ক্যালাস বলা হয়। এ টিস্যু মন্ড থেকে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে একাধিক অণুচারা উৎপন্ন হয়।

৬। চারা উৎপাদন : মুকুলগুলোকে সাবধানে কেটে নিয়ে মূল উৎপাদনকারী মিডিয়ামে রাখা হয় এবং সেখানে প্রতিটি মুকুল, মূল সৃষ্টি করে পূর্ণাঙ্গ চারায় পরিণত হয়।

চিত্র ১৪.২.১ : টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

৭। চারা টবে স্থানান্তর : উপযুক্ত সংখ্যক সুগঠিত মূল সৃষ্টি হলে পূর্ণাঙ্গ চারা গাছ কালচার করা পাত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে ধীর প্রক্রিয়ায় সাবধানতার সাথে টবে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারাগাছ উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৮। প্রাকৃতিক পরিবেশে তথা মাঠ পর্যায়ে স্থানান্তর : টবসহ চারাগাছকে কিছুটা আর্দ্র পরিবেশে রাখা হয়। টবে লাগানো চারাগুলো কক্ষের বাইরে রেখে মাঝে মাঝে বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। পূর্ণাঙ্গ চারাগুলো সজীব ও সবল হয়ে উঠলে সেগুলোকে এক পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাটিতে লাগানো হয়।

উল্লেখ্য, টিস্যু কালচার প্রযুক্তিকে বর্তমানে অনেক ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। টিস্যু কালচারের প্রয়োগ পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যভেদে বিভিন্ন রকম হয়। কী ধরনের উদ্ভিদ থেকে কোন প্রকৃতি ও আকারের টিস্যু ব্যবহার করতে হবে এবং কী ধরনের কালচার মিডিয়াম ব্যবহার করা হবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে কালচারের উদ্দেশ্যের উপর। উপরে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি প্রয়োগভেদে পরিবর্তিত হতে পারে।

টিস্যু কালচার এর ব্যবহার : টিস্যু কালচার প্রযুক্তির কৌশলকে কাজে লাগিয়ে আজকাল উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে এবং উন্নত জাত উদ্ভাবনে ব্যাপক সাফল্য পাওয়া গেছে। জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে কৃষিতে যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এখন উদ্ভিদ কোষ বা টিস্যু থেকে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। টিস্যু কালচার প্রযুক্তি আবিষ্কারের পর থেকে উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজননবিদরা ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছেন। বিশেষ করে বীজ উৎপাদনে অক্ষম উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চারা উৎপাদন সম্ভব। বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ (যেমন- ফুল, ফল, শস্য, ওষুধ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ) এর চাহিদা বিশ্বব্যাপী। এমতাবস্থায় একমাত্র টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প পরিসরে অধিক চারা উৎপাদন সম্ভব। এ প্রযুক্তিকে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগিয়ে অর্কিড, গ্লাডিওলাস, টিউলিপ ও লিলিসহ বহু ফুল ও ফল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ আবাদের মাধ্যমে কৃষি শিল্পে এক বিপ্লবের সম্ভব হয়েছে।

মেরিস্টেম বা ভাজক টিস্যুর কালচারও টিস্যু কালচার প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। উদ্ভিদের শীর্ষ মুকুলের অগ্রভাগের টিস্যুকে মেরিস্টেম বা ভাজক টিস্যু বলা হয়। মেরিস্টেম বা ভাজক টিস্যু অঞ্চলের কোষগুলো এত দ্রুত বিভাজিত হয় যে, সেটা রোগ-জীবাণুমুক্ত থাকে। তাই কোন উদ্ভিদের মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে নতুন রোগমুক্ত উদ্ভিদ পাওয়া অধিকতর সহজ। পরাগধানী বা পরাগরেণু কালচার এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড (n) উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব। উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদসমূহ অতি প্রয়োজনীয়। প্রচলিত সাধারণ উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতিতে বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত হোমোজাইগাস লাইন পাওয়া অনেক সময় সাপেক্ষ। কিন্তু পরাগরেণু বা পরাগধানী কালচারের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব হলে সেটা থেকে সহজেই প্রত্যাশিত ডাবল হ্যাপ্লয়েড (2n) উদ্ভিদ পাওয়া যায়। যেমন- যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে পৃথিবী থেকে অনেক মূল্যবান উদ্ভিদ চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্ত বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা অতীব জরুরী এবং এজন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তিই হচ্ছে উপযুক্ত মাধ্যম। কেননা- এ পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে উল্লিখিত উদ্ভিদ থেকে অধিক চারা উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব। যেমন- ভ্রূণ কালচার হলো টিস্যু কালচার প্রযুক্তির আর একটি বিশেষ দিক। ভ্রূণ কালচার প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যার অনেক সমস্যা সমাধান সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে আন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়নের ক্ষেত্রে ভ্রূণ পূর্ণতা লাভ করে না, ফলে সংকর উদ্ভিদ পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে সংকরায়নের পর ভ্রূণ কালচার করা হয়। ফলে ভ্রূণ আর নষ্ট হতে পারে না এবং পরবর্তীতে ভ্রূণ বিকাশের ফলে নতুন পূর্ণাঙ্গ সংকর উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। এভাবে উৎপন্ন সংকর উদ্ভিদের সাহায্যে উন্নত জাতের উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়। অনেক উদ্ভিদ প্রজাতি যৌন জননে অক্ষম। এক্ষেত্রে উক্ত উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্ট সংযোগের মাধ্যমে সংকরায়ন সম্ভব হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট সংকর (Hybrid) উদ্ভিদ থেকে স্বাভাবিক উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছে।

একই টিস্যু কালচারে সৃষ্ট উদ্ভিদসমূহের মধ্যে জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা দেখা যায়। একে সোমাক্লোনাল ভিন্নতা বা ভ্যারিয়েশন বলা হয়। এরূপ সোমাক্লোনাল ভারিয়েশনকে কাজে লাগিয়ে উন্নত ও কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য (যেমন- অধিক পুষ্টি মান, রোগ প্রতিরোধী) সম্পন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ধাপগুলোর নাম সাইন পেন দিয়ে লিখে পোস্টার পেপার তৈরি করে ক্লাসের বোর্ডে টানিয়ে রাখুন

সারসংক্ষেপ

উদ্ভিদের যে কোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে (যেমন- শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচিপাতা, পত্রবৃন্ত, পরাগধানী, ভ্রূণ, ডিম্বক ইত্যাদি) বিচ্ছিন্ন কোন টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পুষ্টিবর্ধক মাধ্যমে আবাদ করাকে টিস্যু কালচার বলা হয়। টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উল্লিখিত টিস্যু থেকে অধিক সংখ্যক নতুন চারা উদ্ভিদ উৎপাদন করাই টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রাথমিক উদ্দেশ্য। ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করলে টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। যেমন- (ক) কক্ষমুকুল কালচার, (খ) মেরিস্টেম কালচার, (গ) মাইক্রোপ্রোপাগেশন, (ঘ) ক্যালাস কালচার এর মাধ্যমে চারা উৎপাদন, (ঙ) দৈহিক কোষ থেকে ভ্রূণ উৎপাদন, (চ) পরাগধানী কালচার এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করলে টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। যেমন-

i. কক্ষমুকুল কালচার ii. মেরিস্টেম কালচার iii. মাইক্রোপ্রোপাগেশন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। টিস্যু কালচারে দরকার-

i. জীবাণুমুক্ত মিডিয়াম ii. পুষ্টিসমৃদ্ধ মিডিয়াম iii. পানিপূর্ণ মিডিয়াম

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। বর্তমান সময়ে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার খুব বেশি হয়-

i. শিল্পক্ষেত্রে ii. স্বাস্থ্যক্ষেত্রে iii. পরিবেশ রক্ষায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। বহুল ব্যবহৃত জীবপ্রযুক্তি হলো-

i. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ii. টিস্যু কালচার iii. জিন প্রকৌশল

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৩ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির প্রধান ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি, বাহক, রেস্ট্রিকশন এনজাইম, পোষক

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যা জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিকতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মাত্র ১৫০ বছর পূর্বে গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮৬৬) বংশগতির দুটি মূল সূত্র আবিষ্কার করেন। T. Boveri এবং E.S. Sutton (১৯০২) ক্রোমোসোমকে হেরিডিটির বাহক বলে আখ্যায়িত করেন। পরে O.T. Avery, C.M. Mcleod এবং Mary Mc Carty (১৯৪৪) প্রমাণ করেন যে, জিন কোষে ডিএনএ একমাত্র উপাদান যা জীবের জিনের সমষ্টিগত মলিক্যুলার প্রকৃতিবিশিষ্ট। J.D. Watson এবং F.H.C. Crick (১৯৫৩) ডিএনএ এর মডেল তথা আণবিক গঠন প্রস্তাব করেন। পরে G.L. Shapiro ও তাঁর সহকর্মীরা (১৯৬৯) *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়ার ল্যাক্টোজ অপেরন বা ল্যাক (lac) জিনটি পৃথক করেন। বস্তুত এর পর শুধু জিন পৃথককরণই নয়, এক প্রজাতির জিন পৃথক করে অন্য প্রজাতির জিনে স্থানান্তর করা, সংমিশ্রিত জিন জীব তৈরি করা, জিন সংযোজন (Splicing), জিনের রিকম্বিনেশন (Recombination) বা পুনর্যোজন প্রভৃতি হয়ে পড়ে সমসাময়িক জেনেটিক্সের গবেষণার বিষয়বস্তু। এসব গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেনেটিক্সের এক নতুন শাখা, যার নাম বংশগতি প্রকৌশল বা জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering)। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে, জেনেটিক্সের যে শাখা জিনের পৃথকীকরণ, সংযোজন ও সংশ্লেষণ করে তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে DNA এর কাঙ্ক্ষিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে এবং প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে। মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে স্থানান্তরিত করে ঐ ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (Recombinant DNA Technology) বলে।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি : অধিকাংশ জীবের বংশগতীয় উপাদান হলো DNA। বিভিন্ন ধরনের এনজাইম, প্রোটিন এবং RNA অণুর সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর তথ্য DNA অণুতেই সন্নিবেশিত থাকে। মানব কল্যাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোন জীবের DNA এর পরিবর্তন করে নতুন প্রকৃতির DNA সমন্বয় করার কৌশল ইতিমধ্যে সফলতার সাথে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির দ্বারা জীবের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনা সম্ভব। যে টেকনোলজির মাধ্যমে কোন জীবের DNA তে প্রত্যাশিত গাঠনিক পরিবর্তন আনা যায় সে টেকনোলজি বা পদ্ধতিকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি বলে। একই জিনের (DNA অণু) অসংখ্য কপি তৈরি হওয়াকে জিন ক্লোনিং বলা হয়। জিন ক্লোনিং রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির সাহায্যে ঘটানো হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ কণা নিক্ষেপণ (Particle Bomberdment), জিন বন্দুক (Gene Gun), ইলেক্ট্রোপোরেশন (Electroporation), ট্রান্সফর্মেশন

(Transformation), ট্রান্সফেকশন (Transfection), লাইপোসোম (Lyposome) প্রভৃতির মাধ্যমে জিন বা DNA খন্ড স্থানান্তর করা হয়।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির মূলনীতি হলো একটি জীব থেকে প্রত্যাশিত একটি নির্দিষ্ট জিন সমন্বিত DNA খন্ড স্থানান্তর করে গ্রাহক (Recipient) কোষে প্রবেশ করানো এবং তথায় উক্ত জিনের বিকাশ ঘটানো। খন্ডিত DNA অংশকে গ্রাহক কোষে প্রবেশ করানোর পদ্ধতিকে ট্রান্সফরমেশন বলা হয়। ট্রান্সফরমেশনের ফলে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এ জীবকে বলা হয় GMO (Genetically Modified Organism) বা GE (Genetically Engineered) বা ট্রান্সজেনিক (Transgenic) জীব।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি প্রয়োগে *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এ ব্যাকটেরিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোষে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি অতিরিক্ত বৃত্তাকার DNA অণু আলাদাভাবে থাকে। এ অতিরিক্ত DNA অণুকে প্লাজমিড (Plasmid) বলে। এ প্লাজমিড এর মাধ্যমে নতুন জিনের সংযোজন এবং সংযোজিত জিনকে অন্য জীবে স্থানান্তর সম্ভব। ইতিমধ্যে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজনীয় ইনসুলিন উৎপাদক জিন *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে স্থানান্তর এবং ইনসুলিন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া একটি বৃদ্ধিকারী হরমোন (সোমাটোস্ট্যাটিন) এর জন্য দায়ী জিন *E. coli* তে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদে অনেক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। যেমন-

(ক) এ পদ্ধতির দ্বারা উৎপন্ন এক ধরনের তরকারী মার্কিন বাজারে ছাড়া হয়েছে, যার নাম ভেজিস্নাক্স সুইট মিনি পিপার বা মিষ্টি মরিচ।

(খ) ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিষ্ঠান ক্যালজিন ইলক জিন প্রযুক্তির সহায়তায় এক ধরনের টমেটো উদ্ভাবন করেছেন, যা সহজে পঁচে না, এ টমেটোর নাম রাখা হয়েছে ফ্লাভ স্যাভর টমেটো।

(গ) BT- বেগুন আবিষ্কারের ফলে ঐ সকল বেগুন এখন আর পোকায় ধরে না।

রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির ধাপ : রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির প্রধান ধাপসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

(ক) প্রত্যাশিত DNA **নির্বাচন ও পৃথকীকরণ :** রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রথম ধাপ হলো প্রত্যাশিত DNA অণু নির্বাচন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জীবকোষ থেকে কোষ মধ্যস্থিত প্রোটিন, শর্করা, লিপিড ও অন্যান্য অংশ থেকে DNA অণুকে আলাদা করা হয়। DNA অণু আলাদা করতে সাধারণত সিজিয়াম ক্লোরাইড বা সুক্রোজ দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ DNA অণু পৃথক করা হয়।

(খ) বাহক নির্বাচন : প্রত্যাশিত DNA অণুকে স্থাপনের জন্য একটি বাহকের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে *E. coli* বা *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়া এর প্লাজমিডকে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রত্যাশিত DNA অণুকে প্লাজমিড DNA তে সংযোজন করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসও ব্যবহৃত হয়।

(গ) প্রত্যাশিত DNA **অণুকে ছেদন :** এক্ষেত্রে প্রথমে প্রত্যাশিত DNA অণুকে কেটে আলাদা করা হয়। প্রত্যাশিত DNA অণুকে কাঁটতে একটি বিশেষ এনজাইম (রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইম দ্বারা DNA ছেদন করা হয়) ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫০টি রেস্ট্রিকশন এনজাইম আবিষ্কৃত হয়েছে। যথা- Eco RI, Hind III, Bam HI ইত্যাদি। রেস্ট্রিকশন এনজাইম DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সাজান অংশকে অসমভাবে কেঁটে দেয়। এরূপ কাঁটার ফলে DNA অণুর দুটি স্ট্রান্ডের একটি অপরটি থেকে লম্বা থাকে, ফলে প্রত্যাশিত DNA খন্ডটি বাহক DNA অণুর সাথে সহজে যুক্ত হতে পারে। খন্ডিত DNA অণুর প্রান্তদ্বয় আঁঠালো প্রকৃতির হয়, তাই একে আঁঠালো প্রান্ত (Sticky end) বলে।

(ঘ) ছেদনকৃত প্রত্যাশিত DNA **অণুকে বাহক প্লাজমিডে সংযোজন :** এক্ষেত্রে প্রথমে বাহক প্লাজমিডের DNA অণুকে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ দ্বারা ছেদন করা হয়। অতঃপর প্লাজমিড DNA এর ফাঁকা অংশে প্রত্যাশিত DNA খন্ডকে প্রতিস্থাপন করা হয়। প্লাজমিড DNA এর ফাঁকা অংশে প্রত্যাশিত DNA অণু সংযুক্ত করতে DNA লাইগেজ (DNA ligase- এ এনজাইম DNA এর খন্ডিত অংশকে জোড়া লাগায়)এনজাইম সহায়তা করে। প্লাজমিড DNA এর সাথে প্রত্যাশিত DNA অণু সংযুক্ত হবার পর যে DNA তৈরি হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট (Recombinant DNA) ডিএনএ বলে।

(ঙ) পোষক নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট DNA **কে পোষকে স্থাপন :** প্রত্যাশিত DNA অণুর বংশবৃদ্ধির জন্য রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড DNA কে পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করানো হয়। ব্যাকটেরিয়ার কোষ বিভাজনের সাথে সাথে উক্ত

কোষে অবস্থিত রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড DNA (প্রত্যাশিত DNA অণু যুক্ত) অণুরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এভাবে প্রত্যাশিত DNA অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ পরে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় কাঙ্খিত উদ্ভিদ কোষে প্রবেশ করানো হয়। এরূপ উদ্ভিদকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলে।

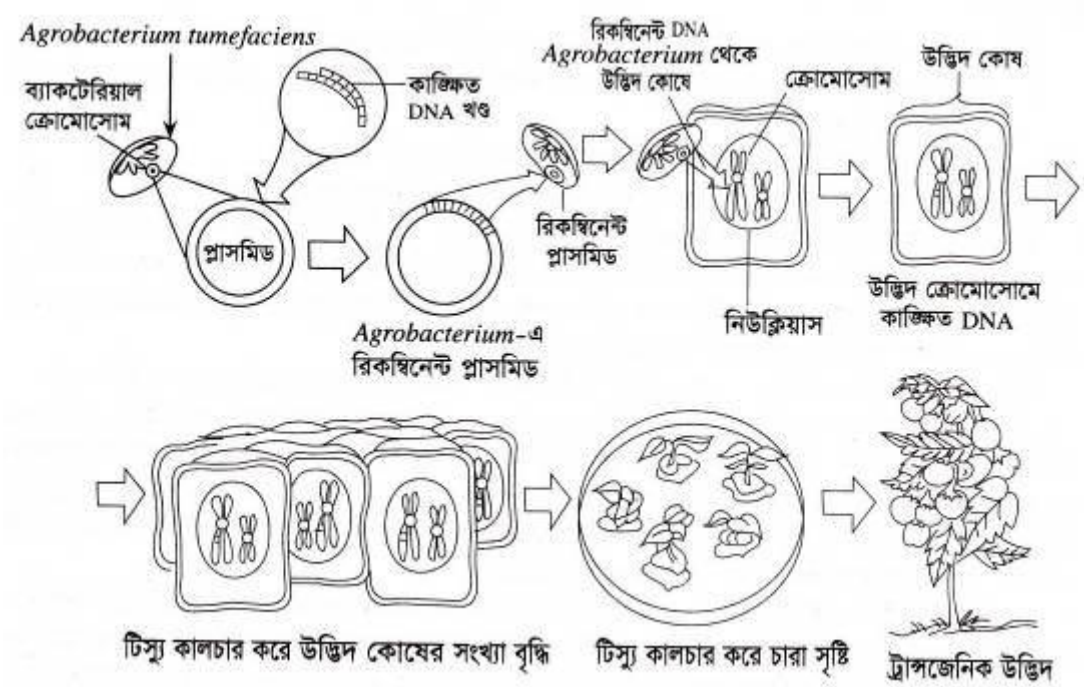

চিত্র ১৪.৩.১ : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন ধাপ

শিক্ষার্থীর কাজ	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধাপগুলোর নাম সাইন পেন দিয়ে লিখে পোস্টার পেপার তৈরি করে ক্লাসের বোর্ডে টানিয়ে রাখুন

সারসংক্ষেপ

জেনেটিক্সের যে শাখা জিনের পৃথকীকরণ, সংযোজন ও সংশ্লেষণ করে তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (Recombinant DNA Technology) বলে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধাপগুলো হলো- প্রত্যাশিত DNA নির্বাচন ও পৃথকীকরণ, বাহক নির্বাচন, প্রত্যাশিত DNA অণুকে ছেদন, ছেদনকৃত প্রত্যাশিত DNA অণুকে বাহক প্লাজমিডে সংযোজন, পোষক নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষকে স্থাপন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। ডিএনএ কাঁটার জন্য বিশেষ এনজাইম কোনটি ?

(ক) লাইগেজ (খ) লেকটেজ (গ) লাইপেজ (ঘ) রেস্ট্রিকশন

২। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে-

i. জিনের পরিবর্তন ঘটানো হয়
ii. ডিএনএ এর পরিবর্তন ঘটানো হয়
iii. জীবের পরিবর্তন ঘটানো হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৪ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

নিম্নলিখিত বিষয়ে জেনেটিক ইঞ্জিয়ারিং এর ব্যবহার উল্লেখ করতে পারবেন-

- কৃষি উন্নয়নে
- ঔষধ শিল্পে
- গৃহপালিত পশু ও মৎস্য উন্নয়নে
- দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে
- ফরেনসিক টেস্টের ক্ষেত্রে
- পরিবেশ রক্ষায়

	প্রধান শব্দ	এসআইটি, মলিক্যুলার ফার্মিং, ফরেনসিক টেস্ট

কৃষি উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : বর্তমান যুগ জীবপ্রযুক্তি তথা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর যুগ। বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ রক্ষা, মানব স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ, শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতিসহ বিভিন্নক্ষেত্রে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। নিম্নে কৃষি উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার তুলে ধরা হলো-

(ক) টিস্যু কালচার : টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার সুবিধাগুলো হলো-

১। একটি উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ হতে অল্প সময়ের ব্যবধানে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অসংখ্য চারা তৈরি করা যায়।

২। যে সমস্ত উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না, তাদের চারাপ্রাপ্তি ও অল্প খরচে সতেজ অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়।

৩। সহজে রোগমুক্ত, বিশেষ করে ভাইরাসমুক্ত চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৪। ঋতুভিত্তিক চারা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা হতে মুক্ত থাকা যায়।

৫। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে টিস্যু কালচার নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃত এবং

৬। সঠিক বীজ সংগ্রহ ও মজুদ করার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

(খ) অধিক ফলনশীল উদ্ভিদজাত সৃষ্টি : কোন বন্যজাত এর জিন অপর ফসলী শস্যের মধ্যে সঞ্চালিত করে অধিক ফলনশীল শস্য উৎপাদন করা যায়। যেমন- ধান-IR_8, IR_{28}, IR_{29}, গম, পাট, তেলবীজ ইত্যাদি।

(গ) গুণগত মান উন্নয়নে : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে প্রাণী ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির গঠন, বর্ণ, পুষ্টিগুণ, স্বাদ ইত্যাদির উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন- অস্ট্রেলিয়াতে ভেড়া পালন বহুল প্রচলিত। ভেড়া মাংস ও পশম দেয়। এদের লোম উন্নত করতে সালফার দরকার। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফলে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপাদনকারী জিনকে *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড ডিএনএ এর সাহায্যে ঘাসে প্রবেশ করানো হয়। উক্ত ঘাস খেলে ভেড়া থেকে উন্নত মানের লোম পাওয়া যায়।

(গ) সুপার রাইস সৃষ্টি : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে সুইডেনের বিজ্ঞানীরা সুপার রাইস (গোল্ডেন রাইস) নামক এক ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন। ইহা ভিটামিন 'A' সমৃদ্ধ। সম্প্রতি আই. পট্রিকাস (১৯৯৯) Japonica জাতের সুপার ধান উদ্ভাবন করেছেন। এ ধান বিটা ক্যারোটিন সংশ্লেষ করে এবং অতিরিক্ত পরিমাণ লোহা শরীরে যোগান দেয়। কৃষি গবেষণায় এটি একটি মাইলফলক।

(ঘ) আগাছানাশক ঔষধ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি : আগাছানাশক ঔষধ প্রতিরোধী জিন প্রতিস্থাপন করে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন- *Streptomyces hygroscopicus* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে পৃথককৃত Bar

জিন টমেটো, আলু ও তামাকে স্থানান্তর করে ফসফিনোথ্রিসিন নামক আগাছা নাশকের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করা হয়েছে।

(ঙ) রোগ-প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবন : ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও নানা রকমের কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

(চ) ভিটামিন সমৃদ্ধ ভুট্টার জাত সৃষ্টি : সম্প্রতি স্পেনের একদল গবেষক জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভুট্টার বীজ উদ্ভাবন করেছেন যাতে ভিটামিন 'সি', বিটা ক্যারোটিন ও ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যাবে।

(ছ) নাইট্রোজেন সংবন্ধন : নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া হতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য দায়ী নিফ (nif) জিন যা *E.coli* নামক ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, নিফ জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সার ছাড়া অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে।

(জ) স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা শাক সব্জি, ফল ও শুঁটকির ক্ষতিকর পতঙ্গ, মশা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক (SIT) উদ্ভাবন করে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জাপান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, গুয়াতেমালা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপক প্রচলিত। বাংলাদেশের সাভারে অবস্থিত পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক দল বিজ্ঞানী সব্জির পোকাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

(ঝ) দ্যুতিময় উদ্ভিদ সৃষ্টি : জোনাকি পোকার আলো সৃষ্টিকারী জিন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা তামাক গাছে স্থানান্তরের ফলে তামাক গাছ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়।

(ঞ) ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সফলভাবে প্রয়োগ করে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় ৬০টিরও বেশি প্রজাতিতে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এরমধ্যে তামাক, টমেটো, আলু, মিষ্টি আলু, লেটুস, সূর্যমুখী, বাঁধাকপি, তুলা, সয়াবিন, মটর, শসা, গাঁজর, মূলা, পেঁপে, আঙ্গুর, কৃষ্ণচূড়া, গোলাপ, আপেল, নাসপাতি, নিম, ধান, গম, রাই, ভুট্টা, বেগুন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলো পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রতিরোধী এবং এগুলো যে কোনো পরিবেশকে মোকাবিলা করতে সক্ষম।

ঔষধ শিল্পে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ঔষধ শিল্পে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন, হরমোন, ইন্টারফেরন, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি প্রভৃতি উৎপাদন এবং রোগ শনাক্তকরণ ও জিন থেরাপির মাধ্যমে সুস্থ-সবল শিশুর জন্মদান এ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বৈপ্লবিক অবদান রাখছে। মারাত্মক রোগব্যাধি শনাক্তকরণের পাশাপাশি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে ঔষধ উৎপাদনের প্রক্রিয়া জোরালো হয়েছে। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো-

(ক) ভ্যাকসিন উৎপাদন : বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ করে ব্যাপকহারে বিভিন্ন ভ্যাকসিন বা টিকা উৎপাদন করা হচ্ছে যেগুলো পোলিও, যক্ষ্মা, হাম, বসন্তসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের রোগ প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(খ) ইন্টারফেরন উৎপাদন : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুর সমন্বয়ে গঠিত এ উপাদানটি দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অত্যন্ত কার্যকরী। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক উপায়ে ইন্টারফেরন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এটি হেপাটাইটিস এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং ক্যান্সার রোগীদেরকে প্রাথমিকভাবে ইন্টারফেরন প্রয়োগ করে ক্যান্সারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

(গ) হরমোন উৎপাদন : বিভিন্ন ধরনের হরমোন যেমন ডায়াবেটিস রোগের ইনসুলিন, মানুষের দেহ বৃদ্ধির হরমোন ইত্যাদি উৎপাদন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত হরমোন সহজসাধ্য এবং দামেও কম হয়।

(ঘ) অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন : কম সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ করে বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদিত হচ্ছে। যেমন- পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, পলিমিক্সিন ইত্যাদি।

(ঙ) এনজাইম উৎপাদন : জীবের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন এনজাইমের বাণিজ্যিক ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ঔষধ তৈরিতে, বয়ন শিল্পে, চামড়া শিল্পে, বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে, কাগজ শিল্পে এবং লন্ড্রী শিল্পে বিভিন্ন এনজাইম ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আণবিক জীববিজ্ঞানসহ বিভিন্ন গবেষণা কাজে এনজাইম ব্যবহার

করা হচ্ছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর কল্যাণে ব্যবহৃত কিছু এনজাইম হলো- অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজ, পেকটিনেজ ইত্যাদি।

(চ) ট্রান্সজেনিক প্রাণী থেকে ঔষধ আহরণ : ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাণীগুলোর দুধ, রক্ত ও মূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ আহরণ করা হয়। একে Molecular Farming বলা হয়।

গৃহপালিত পশু ও মৎস্য উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

উন্নতজাতের পশু উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে- চর্বিমুক্ত মাংস উৎপাদন, দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি, দ্রুত বিক্রয়যোগ্য করা, দ্রুত বৃদ্ধি সম্পন্ন, রোগ প্রতিরোধী এবং কিছু মূল্যবান প্রোটিন উৎপাদনসমৃদ্ধ করা। বিভিন্ন ট্রান্সজেনিক প্রাণী যেমন- শূকর, মুরগী, খরগোশ, গরু, ভেড়া তৈরিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইতিমধ্যে ট্রান্সজেনিক ভেড়া উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর প্রতিলিটার দুধে ৩৫ গ্রাম পর্যন্ত হিউম্যান আলফা অ্যান্টিট্রিপসিন প্রোটিন পাওয়া যায়। এ প্রোটিনের অভাবে এমকাইসেমা নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে ভেড়ার দেহের মাংস বৃদ্ধি এবং শরীরের পশম বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। চর্বিহীন মাংস ও মানুষের হরমোন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রান্সজেনিক শূকর উদ্ভাবন সফল হয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে ট্রান্সজেনিক ছাগল। এসব ছাগলের দুধে পাওয়া যায় এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন যা জমাট বাঁধা রক্তকে গলিয়ে করোনারি থ্রম্বোসিস থেকে মানুষকে রক্ষা করে। ট্রান্সজেনিক গরু উদ্ভাবনের মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মাতৃদুগ্ধের অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ল্যাকটোফেরিনও পাওয়া গেছে। এরপর মাগুর, কৈ, কমনকার্প, লইট্টা এবং তেলাপিয়া মাছে স্যামন মাছের বৃদ্ধি হরমোনের জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে কৌলিকগত পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় এ সকল মাছের আকার প্রায় ৬০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

দুধের সরাসরি নানাবিধ ব্যবহার থাকলেও দুধ থেকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। যেমন- দুধ থেকে মাখন, পনির, দই ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রী তৈরির জন্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা নানা রকমের ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন- *Streptococcus lactis, Lactobacillus helveticus, L. bulgaricus* ইত্যাদি। নিম্নে দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

(ক) মাখন- মাখনের ঘ্রাণ ও স্বাদ তৈরির জন্য এতে *Leuconostoc citrovorum* নামক ব্যাকটেরিয়া মিশানো হয়। মিশানো ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপন্ন এনজাইম মাখনের সাইট্রেটকে ডাই অ্যামাইলে পরিণত করার মাধ্যমে মাখনে বিশেষ সুগন্ধ ও স্বাদ সৃষ্টি হয়।

(খ) পনির- পনির তৈরিতে *Streptococcus lactis* এবং *Lactobacillus helveticus* নামক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। পনির তৈরি পদ্ধতিতে দুধের জমাট বাঁধা অংশে আর্দ্রতার পরিমাণের উপরেই পনিরের গুণাগুণ নির্ভর করে। কখনও কখনও পনিরের সাথে লবণ মিশিয়ে এ সুগন্ধ ও আর্দ্রতা রক্ষা করা হয়। লবণ ব্যবহারের ফলে পনিরে অনাকাঙ্ক্ষিত অণুজীবের আক্রমণ প্রতিহত করে। বাজারে ৩ ধরনের পনির বিক্রি হয়। যথা- নরম, আধা-নরম এবং শক্ত পনির। পনিরের স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের তারতম্য ঘটে। পৃথিবীর সুস্বাদু পনির উৎপাদনের জন্য ইতালি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য বিখ্যাত। এ উৎকৃষ্ট মানের পনির উৎপাদন সম্ভব হয়েছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে।

(গ) দই- দুধে ল্যাকটোজ নামক শর্করা থাকায় তা থেকে দই বা দই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ল্যাকটিক অ্যাসিড নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া (প্রধানত *Streptococcus thermophilus* এবং *Lactobacillus bulgaricus*) ল্যাকটোজ থেকে গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোজ তৈরি করে। দইয়ের গুণাগুণ নির্ভর করে ব্যবহৃত ব্যাকটেরিয়া জাতের উপর। এভাবে দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফরেনসিক টেস্টের ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

রক্ত, বীর্য রস, মূত্র, অশ্রু, লালা ইত্যাদির ডিএনএ অথবা অ্যান্টিবডি থেকে ফরেনসিক টেস্টের মাধ্যমে অপরাধীকে শনাক্ত করা হয় । সেরোলজি টেস্ট দ্বারা মানুষের রক্ত, বীর্য এবং লালাকে চিহ্নিত করে তা ডিএনএ বিশ্লেষণ দ্বারা অপরাধীকে শনাক্ত করা হয়। আমরা এ পর্যন্ত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর অবদান সম্পর্কে যা আলোচনা করলাম এগুলো ছাড়াও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ করে 'হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট' এর মাধ্যমে মানবদেহের বিভিন্ন ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনগুলোর অবস্থান ও কাজ সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে মানবদেহে ক্ষতিকর জিনকে অপসারণ করে সুস্থ জিন প্রতিস্থাপন করা যায়। একে জিন থেরাপি বলা হয়।

পরিবেশ রক্ষায় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

(ক) পয়ঃপ্রণালি শোধন ও মানুষের মলমূত্র দুর্গন্ধমুক্তকরণে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর অবদান অবর্ণনীয়, (খ) পেট্রোল ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের গুণাগুণ রক্ষার্থে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, (গ) বিভিন্ন আবর্জনা ও কলকারখানা থেকে নির্গত ময়লা পানির বিষাক্ততা হ্রাসকরণে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, (ঘ) পরিবেশ সুরক্ষা এবং রোগাক্রান্ত উদ্ভিদে পেস্টিসাইডেরে ব্যবহার হ্রাস করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগের জৈবিক নিয়ন্ত্রণে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং (ঙ) জিন ব্যাংক স্থাপন করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন	
Molecular Farming কী ?	SIT এর ইলাবোরেশন লিখুন	Japonica জাতের সুপার ধান কে উদ্ভাবন করেছেন ?

সারসংক্ষেপ

টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার সুবিধাগুলো হলো-

১। একটি উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ হতে অল্প সময়ের ব্যবধানে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অসংখ্য চারা তৈরি করা যায়।

২। যে সমস্ত উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না, তাদের চারাপ্রাপ্তি অল্প খরচে সতেজ অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়।

৩। সহজে রোগমুক্ত, বিশেষ করে ভাইরাসমুক্ত চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৪। ঋতু ভিত্তিক চারা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা হতে মুক্ত থাকা যায়।

৫। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে টিস্যু কালচার নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃত এবং

৬। সঠিক বীজ সংগ্রহ ও মজুদ করার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাণীগুলোর দুধ, রক্ত ও মূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ আহরণ করা হয়। একে Molecular Farming বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহৃত হয়-

i. চিকিৎসা ক্ষেত্রে ii. পরিবেশ সুরক্ষায় iii. চোর ধরার কাজে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বেশি ব্যবহার লক্ষ করা যায়-

i. চিকিৎসা ক্ষেত্রে ii. প্রাণী উন্নয়নে iii. পরিবেশ রক্ষায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ হলো-

i. কলা ii. জাম iii. বেগুন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

একটি কৌশলের মাধ্যমে বাবুলের বাবা এক ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন। ইহা ভিটামিন 'A' সমৃদ্ধ।

৪। উল্লিখিত ধানের নাম কী ?

(ক) সুপার রাইস (খ) সুপার ধান (গ) মিনিকেট (ঘ) IR_{28}

৫। উল্লিখিত ধানটি কেমন ফলন দেয় ?

(ক) অধিক (খ) কম (গ) মাঝামাঝি (ঘ) নিম্ন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন- ১

শ্রেয়সী রহমান তার নানার বাড়িতে একটি কাঁঠাল গাছ দেখতে পেলেন। গাছটিতে দেখলেন অন্যান্য গাছের তুলনায় ফলন বেশি এবং স্বাদেও অনেক মিষ্টি। তিনি গাছটি থেকে কক্ষমুকুল সংগ্রহ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবে অসংখ্য চারা উৎপাদন করলেন এবং চারাগুলো বপন করে অসংখ্য মিষ্টি জাতের কাঁঠাল পেলেন।

(ক) টিস্যু কালচার বলতে কী বোঝেন ?

(খ) জীবপ্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলোর নাম উল্লেখ করুন।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির ধাপগুলো চিহ্নিত চিত্রের মাধ্যমে দেখান।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

সৃজনশীল প্রশ্ন- ২

ময়মনসিংহ অঞ্চলে কৈ মাছের মড়ক দেখা দিয়েছে। এতে হাজার হাজার মাছ মারা যাচ্ছে। কিন্তু বরিশাল বিভাগের দেশি কৈ মাছের এ রকম রোগ সচরাচর দেখা যায় না। মৎস্য বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বরিশাল বিভাগের কৈ মাছ থেকে এক প্রকার জিন ময়মনসিংহ অঞ্চলের কৈ মাছে স্থানান্তর করলেন। এতে ময়মনসিংহ অঞ্চলে কৈ মাছের মড়ক রোগ কমে গিয়েছে।

(ক) জিমও (GMO) কী ?

(খ) দুটি রেস্ট্রিকশন এনজাইমের নাম লিখুন।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির ধাপগুলো চিহ্নিত চিত্রের মাধ্যমে দেখান।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি জীবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ- বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.২ : ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৩ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৪ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক ৫। ক